



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 257 - 265

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

মতি নন্দীর ‘বেহুলার ভেলা’ : মিথের আধুনিক রূপান্তর

ধুব মুন্সী

Email ID: munsidhruba@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Moti Nandi;
Behular Bhela;
Time and
Literature;
Transformation of
Myth; Modernity
and Myth;
Reconstruction
and
Deconstruction;
Modern Marital
Life; Existential
Crisis; Socio-
economic Reality.

Abstract

Time is never static—it moves forward like an invisible yet inevitable current of a river. Upon its surface drift countless rafts: some carrying ancient myths, others bearing the weight of everyday human life. Literature travels silently alongside these rafts, reshaping its language, symbols, and sensibilities in response to the flow of time. While ancient myths staged dramatic confrontations between gods and humans, life and death, modern literature turns inward, revealing the slow erosion, fatigue, and persistent struggle for survival within the human condition. The figure of Behula from the Manasamangal tradition thus ceases to be merely a mythic heroine; she emerges as an enduring symbol, continually transformed by time.

Moti Nandi's *Behular Bhela* stands as a sensitive and profound testament to this transformation. Although the mythic journey of Behula and Lakshindar is not explicitly narrated, their very absence becomes the narrative's central force. Through the fractured realities of modern marriage, the muted barrenness of relationships, economic pressures, and the monotonous repetitions of daily life, myth reappears in an altered form. In place of divine intervention, the story foregrounds the relentless pressure of time—an invisible force that gradually breaks individuals down, yet compels them to endure. The quotidian details of the narrative—the smell of cooking meat, the oppressive heat of noon, the darkness of night, the subtle shifts of light and shadow—function as symbols of human existence. These are no longer mere settings; they become markers of the burden of living itself. Where mythic narratives once promised transcendence over death through love and sacrifice, modern narratives portray survival as an unceasing, almost mechanical struggle. There is no heroism here, no grandeur—only endurance. This contemporary Behula does not rescue her husband from death; instead, she preserves everyday life itself—the household, habit, and the fragile structure that makes survival possible. Her raft does not move toward liberation; it merely drifts in rhythm with time. This raft becomes a metaphor for modern life: continuous, exhausted, yet strangely resistant to collapse.

Thus, *Behular Bhela* is not merely a short story; it is a philosophical and cultural journey of literature alongside time. Here, myth is dismantled and reconstituted with new meanings; modernity questions tradition without completely severing ties with it. Through this fragile bridge between myth and

the present, the reader learns how literature, riding the raft of time, confronts humanity with the truths of its own age.

Discussion

সময় কোনো স্থির রেখা নয়— সে এক অদৃশ্য প্রবাহ, যা ক্রমাগত নিজেকে অতিক্রম করে চলে। তাকে থামানো যায় না, কারণ সে বাইরের কোনো শক্তির অধীন নয়; সে নিজেই নিজের গতি, নিজের যুক্তি। এই প্রবাহ কখনো মসৃণ, কখনো অশান্ত— কিন্তু প্রতিটি বাঁকে সে তার পূর্বপরিচয় ভেঙে নতুন রূপে আবির্ভূত হয়। ক্ষয় এখানে ধ্বংসের নাম নয়; বরং তা রূপান্তরের শর্ত। ভাঙনের মধ্য দিয়েই সময় নিজেকে পুনর্গঠন করে, নতুন অর্থে নিজস্ব অস্তিত্বকে সংজ্ঞায়িত করে।

সাহিত্য এই প্রবাহের বাইরের কিছু নয়। সে সময়ের প্রতিবিম্বও নয়— বরং সময়ের সঙ্গে সহযাত্রী। মানুষের জীবনযাপন, তার আশা-হতাশা, বিশ্বাস-সংশয়, ব্যক্তিগত ও সামাজিক সংঘাত— সবকিছু মিলিয়ে যে বাস্তবতা গড়ে ওঠে, সাহিত্য সেই বাস্তবতার ভাষা খোঁজে। তাই সাহিত্য কখনো সম্পূর্ণ হয় না, শেষও হয় না। প্রতিটি যুগ তার কাছে নিয়ে আসে নতুন প্রশ্ন, আর সাহিত্য সেই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে নিজের পুরোনো কাঠামো ভেঙে নতুন রূপের জন্ম দেয়। এই প্রক্রিয়ায় ভাষার ভূমিকা কেবল মাধ্যমের নয়; ভাষা নিজেই এক সক্রিয় ইতিহাস। শব্দে নিরপেক্ষ নয়— তারা সময়ের স্মৃতি বহন করে। কোনো কোনো শব্দ একসময় জীবনের কেন্দ্রে ছিল, পরে তারা ধীরে ধীরে প্রান্তে সরে যায়, কারণ বাস্তবতা বদলে গেছে, অভিজ্ঞতার মানচিত্র পাল্টে গেছে। আবার নতুন শব্দ জন্ম নেয়— যারা আগের ভাষায় ধরা না-পড়া অনুভূতিকে প্রকাশের সুযোগ করে দেয়। এই আসা-যাওয়ার মধ্য দিয়েই ভাষা জীবিত থাকে, আর সাহিত্যের শরীর পায় নতুন স্পন্দন। প্রতিটি যুগ তাই নিজের সাহিত্য নিজে তৈরি করে, আবার পুরোনো সাহিত্যকে নতুনভাবে পড়ে। পাঠের ভেতর দিয়েই পুরোনো রচনাও নতুন অর্থ লাভ করে। এই কারণেই সাহিত্য কখনো অতীত হয়ে যায় না— সে কেবল অবস্থান বদলায়। একসময় যে রচনা ছিল বিশ্বাসের কাহিনি, অন্য সময়ে তা হয়ে ওঠে প্রশ্নের ক্ষেত্র; যে গল্প ছিল নিশ্চিত উত্তরের, তা পরিণত হয় সংশয়ের ভাষায়। এই রূপান্তর সাহিত্যের দুর্বলতা নয়, বরং তার শক্তি।

সাহিত্য আসলে এক চলমান অনুশীলন—নিজেকে বোঝার, সময়কে ছুঁয়ে দেখার, আর মানবজীবনের জটিলতাকে ভাষায় ধরার চেষ্টা। সে কোনো চূড়ান্ত সত্য ঘোষণা করে না; বরং প্রতিটি প্রজন্মের সামনে খুলে দেয় নতুন সম্ভাবনার দরজা। তাই সাহিত্যের যাত্রা কখনো গন্তব্যে পৌঁছায় না। সে ভেসে চলে সময়ের স্রোতে— কখনো ভাঙা নৌকার মতো, কখনো দৃঢ় ভেলার মতো— কিন্তু থামে না। এই অচলনশীল গতির মধ্যেই সাহিত্যের অস্তিত্ব, আর সেই অস্তিত্বেই নিহিত মানবজীবনের অন্তহীন অনুসন্ধান।

আমাদের সংস্কৃতির ভেতর যে পুরাণ— রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ— এক অক্ষয় সম্পদ হিসেবে বিরাজমান, সেখান থেকেই আমরা যুগে যুগে জীবনের অর্থ আহরণ করেছি। কিন্তু যখন সেই পুরাণ-আখ্যানসমূহকে আধুনিক সময়ের আলোয় দেখা হয়, তখন তারা পায় নতুন রূপ, নতুন ভাষা ও নতুন দর্শন। এই পরিবর্তনই হল পুনর্নির্মাণ বা বিনির্মাণের প্রক্রিয়া। বিনির্মাণ মানে হল ভেঙে চুরে এক নতুন কাঠামো তৈরি করা, যেখানে মূল কাহিনির কাঠামো ভিন্ন পথে পরিচালিত হয়। আর পুনর্নির্মাণ মানে মূল কাহিনির কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখে তার ব্যাখ্যা, দর্শন ও প্রেক্ষিতকে বদলে দেওয়া। এই দুটি রূপান্তর প্রক্রিয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা পাই বাংলা সাহিত্যে। উদাহরণস্বরূপ, শম্ভু মিত্রের নাটক ‘চাঁদ বণিকের পালা’ এক বিনির্মাণের নিদর্শন। কারণ এখানে বেহলা-লখিন্দরের পৌরাণিক আখ্যানকে সময়ের প্রেক্ষিতে ভেঙে নতুনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। মূল গল্পের অনুষ্ণ অক্ষুণ্ণ থাকলেও চরিত্রের মানসিক গঠন, সমাজদর্শন ও সময়বোধকে একেবারে আধুনিক রূপে রূপান্তর করা হয়েছে। শম্ভু মিত্র পুরাণের কাঠামো ভেঙে সেখানে যুক্ত করেছেন মানবজীবনের নতুন প্রশ্ন— সময়, সমাজ, বিশ্বাস ও প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিত। ফলে ‘চাঁদ বণিকের পালা’ হয়ে ওঠে শুধুমাত্র পৌরাণিক কাহিনির পুনর্কথন নয়, বরং এক নতুন যুগের আত্মসন্ধানের উপাখ্যান।

অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘কর্ণ কুন্তী সংবাদ’ পুনর্নির্মাণের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। এখানে মহাভারতের কর্ণ ও কুন্তীর সংলাপের ঘটনাটি অপরিবর্তিত থাকলেও, রবীন্দ্রনাথ সেটিকে ব্যাখ্যা করেছেন গভীর মানবিক ও দর্শনগত

স্তরে। কর্ণের বীরত্ব নয়, বরং তার আত্মসম্মান ও মানবিকতার চেতনা— এই দৃষ্টিকোণেই কবি কাহিনিকে নতুন অর্থে উন্মোচন করেছেন। একইভাবে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’-ও পুনর্নির্মাণের অন্তর্ভুক্ত। মধুসূদন রামায়ণের কাহিনিকে এক রেখেছেন, কিন্তু সেখানে রাবণ ও মেঘনাদের চরিত্রকে নায়কোচিত মর্যাদা দিয়ে তিনি ভারতীয় সাহিত্যধারায় এনেছেন ইউরোপীয় শোকগাথার রীতি। অর্থাৎ, ঘটনাবলির কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়েও তিনি দর্শন ও মানবতাবোধের দিক থেকে পুরাণকথাকে নতুন ব্যাখ্যার জগতে নিয়ে গেছেন।

এইভাবে দেখা যায়— সময়ের স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের ভেলাও ক্রমাগত দিক পরিবর্তন করে। পুরাণ বা আদি আখ্যান কখনো বিলুপ্ত হয় না, বরং নতুন সময়ের ভেতর দিয়ে তারা নতুন জীবন পায়, নতুন প্রশ্নে ফিরে আসে, নতুন উত্তরে প্রসারিত হয়। তাই ‘সময়ের ভেলা’ আসলে সাহিত্যেরই ভেলা— যা এক আখ্যান থেকে অন্য আখ্যানের দিকে ভেসে চলে, ভাঙে ও গড়ে নতুন অর্থে, নতুন দৃষ্টিকোণে। বেহুলার ভেলা যেমন একদিকে শোক ও আশার প্রতীক, তেমনি সাহিত্যের ভেলা হল নবজন্মের প্রতীক— যা সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলে অজানার দিকে, অনন্তের পথে।

বাংলা কথাসাহিত্যে পুরাণ ও লোকআখ্যানের পুনর্নির্মাণ এক গভীর প্রবণতা। পুরাণ কেবল ইতিহাস নয়, বরং চিরন্তন মানবজীবনের প্রতীকী ভাষা— যা প্রতিটি যুগে নতুন করে অর্থের জন্ম দেয়। বিশেষত ছোটগল্পের পরিসরে এই পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়া আরও নিবিড়, আরও মনস্তাত্ত্বিক হয়ে ওঠে। মনসামঙ্গল কাহিনি, যা বাংলার লোকজ সংস্কৃতির এক গভীর উৎস, সেই আখ্যানই আধুনিক গল্পকারদের হাতে ফিরে আসে নিতান্ত অন্য এক রূপে। মহাশ্বেতা দেবীর ‘বেহুলা’, সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ‘সতত বেহুলা’, বিমল করের ‘বেহুলা’— এরা প্রত্যেকে নিজ নিজ সময়ে বেহুলার চিরপরিচিত কাহিনিকে নতুন দৃষ্টিতে দেখেছেন। কিন্তু মতি নন্দীর ‘বেহুলার ভেলা’ সেই ধারার মধ্যেও এক অনন্য উদাহরণ, কারণ এখানে বেহুলা নেই, অথচ বেহুলার উপস্থিতিই সর্বত্র।

মতি নন্দী বেহুলার পৌরাণিক যাত্রাকে স্থানান্তর করেছেন স্বাধীনোত্তর ভারতের অস্থির সময়ে— যেখানে যুদ্ধের আতঙ্ক, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, এবং মধ্যবিত্ত জীবনের ঘেরাটোপ এক নতুন মিথ তৈরি করেছে। এই গল্পে নেই কোনো দেবতা, নেই মনসার প্রতিহিংসা বা অলৌকিক চিত্র; আছে কেবল মানুষ— তার ক্ষুদ্র ভয়, তার অদম্য বেঁচে থাকার ইচ্ছা, আর তার অন্তহীন সংগ্রাম। ফলে ‘বেহুলার ভেলা’ হয়ে ওঠে পুরাণের ভেতরে লুকিয়ে থাকা মানবিক আখ্যানের পুনরুজ্জীবন, এক বিনির্মিত বেহুলা-কথা— যেখানে বিশ্বাসের ভেলা পরিণত হয়েছে বাস্তব জীবনের প্রতীকী ভেলায়।

বিনির্মাণের ধারণা আলোচনার পূর্বে এখানে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে জাক দেরিদার চিন্তন। তাঁর ‘Of Grammatology’ গ্রন্থেই বিনির্মাণের বীজ রোপণ ঘটে, যেখানে তিনি বলেন, কোনো পাঠ কখনো চূড়ান্ত নয়; প্রতিটি লেখাই নিজের ভেতর বহন করে নতুন অর্থের সম্ভাবনা। পাঠের ভেতরেই জন্ম নেয় অন্য পাঠ, আর সেই অসংখ্য পাঠের সংঘাতে গঠিত হয় অর্থের স্রোত। বিনির্মাণ এই কেন্দ্রচ্যুতির প্রক্রিয়া— যা পূর্বনির্ধারিত অর্থকে ভেঙে দিয়ে উন্মোচন করে নিত্যনতুন ব্যাখ্যার দ্বারা। মতি নন্দীর গল্প এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিশ্লেষণযোগ্য। তিনি পুরাণকে প্রত্যাখ্যান করেননি; বরং পুরাণের অন্তর্নিহিত মানব-সত্যকে স্থানান্তর করেছেন এক নতুন সময়ে। মনসামঙ্গল কাহিনিতে বেহুলা স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করে, দেবতা ও মানুষের সম্পর্কের সেতু নির্মাণ করে। কিন্তু ‘বেহুলার ভেলা’য় কোনো দেবতার স্থান নেই— আছে মানুষের নিজস্ব লড়াই। জাপানি বোমার ভয়ে সন্ত্রস্ত কলকাতা, ব্ল্যাকআউটের অন্ধকার, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি— এই পরিপ্রেক্ষিতেই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের দিনযাপন হয়ে ওঠে এক ভিন্নধর্মী পৌরাণিক যাত্রা। এখানে নন্দীর স্রোত বদলে গেছে— বেহুলার ভেলা আর মন্ত্রপূত নয়, বরং বাস্তবতার ঘোলাজলে বাঁচার এক মরিয়া প্রয়াস।

গল্পে বেহুলা নামে কোনো চরিত্র নেই, কিন্তু প্রতিটি চরিত্রই যেন বেহুলার প্রতিরূপ— তারা হারায়, সংগ্রাম করে, তবু থেমে যায় না। এই অনুপস্থিত বেহুলাই আসলে গল্পের কেন্দ্র। তিনি উপস্থিত তার অনুপস্থিতির মধ্য দিয়ে। তাঁর প্রতীক হয়ে ওঠে শহরের প্রতিটি নারী, প্রতিটি মানুষ, যারা প্রতিকূল সময়ের ঢেউয়ের মধ্যেও জীবনকে আঁকড়ে ধরে। এখানেই মতি নন্দীর কাহিনি বিনির্মিত— কারণ তিনি পুরাণের স্থির অর্থকে ভেঙে এনে বসিয়েছেন সময়ের জীবন্ত মুখে। যা দেরিদার ভাষায়, প্রতিটি পাঠের ভেতরে আরেকটি পাঠ লুকিয়ে থাকে। মতি নন্দীর ‘বেহুলার ভেলা’ এই দ্বৈত পাঠের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। একদিকে এটি নিম্নবিত্ত জীবনের নৈরাশ্য, অনিশ্চয়তা ও প্রতিদিনের সংগ্রামের বাস্তব চিত্র; অন্যদিকে, এটি

পৌরাণিক প্রতীকভাষায় রচিত এক অন্তর্লৌকিক যাত্রা— যেখানে বেহুলা নামের চিরন্তন চরিত্রটি রূপান্তরিত হয়েছে প্রতিরোধের প্রতীকে, টিকে থাকার শক্তিতে।

মনসামঙ্গলের আদি পাঠে দেবতার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ছিল পরাধীনতার— মনসার অভিশাপ, চাঁদ সদাগরের অবিশ্বাস, আর বেহুলার প্রার্থনা। কিন্তু মতি নন্দীর পৃথিবীতে মানুষ একা, তাকে আর দেবতা রক্ষা করে না; বরং মানুষকেই হতে হয় নিজের বেহুলা, নিজের উদ্ধারকর্তা। তাই তাঁর গল্পে ভেলার প্রতীকও বদলে যায়— সেটি আর দেবতার উদ্দেশ্যে যাত্রা নয়, বরং মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার শেষ আশ্রয়। এইভাবেই ‘বেহুলার ভেলা’ পুরাণের কেন্দ্রীভূত অর্থ ভেঙে নতুন মানে নির্মাণ করে। যেখানে বিশ্বাস পরিণত হয় মানবিক সংগ্রামে, আর দেবত্ব স্থান দেয় নিত্যজীবনের কষ্টে। মতি নন্দীর দৃষ্টিতে বেহুলা আর পৌরাণিক নারী নয়, তিনি সময়ের সন্তান; তাঁর ভেলা আজও ভাসে— তবে সে ভেলা দেবলোকে নয়, এই নিত্যবিধ্বস্ত জীবনের নদীতে।

মতি নন্দীর ‘বেহুলার ভেলা’ গল্পে পুরাণের বেহুলা যেন অদৃশ্য, অথচ সর্বত্র উপস্থিত— প্রতিটি নারী, প্রতিটি মা, প্রতিটি কন্যার মধ্যে। এই গল্পের কেন্দ্রে যে পরিবার— প্রমথ, অমিয়া, আর তাদের সন্তানরা— তারা কোনো দেবতার করুণা প্রত্যাশা করে না, বরং নিজেদের দৈনন্দিন সংগ্রামের মধ্যে খুঁজে ফেরে মুক্তির স্বাদ, যেটি আজ কেবল একটুখানি উষ্ণ ভাত, একটুখানি ভালোবাসা বা একটুখানি মাংসের স্বাদে লুকিয়ে আছে। অফিস শেষে প্রমথের মাংস কিনে ফেরাটা এক প্রতীকী দৃশ্য— এক নিম্নমধ্যবিত্ত পুরুষের ক্ষুদ্র অথচ মহৎ চেষ্টার প্রতীক, যে জীবনের ক্লান্তি ভেঙে পরিবারের মুখে একটু হাসি আনতে চায়। কিন্তু সেই মাংসের টুকরোই হয়ে ওঠে গল্পের ‘বেহুলার ভেলা’। কারণ এটি শুধু খাদ্যের প্রতীক নয়— এটি সংসারের টিকে থাকার প্রতীক, ভালোবাসার ভগ্ন চিহ্ন, আর মানুষের অনন্ত আশার অবশেষ। মাসের শেষে অর্থস্বল্পতার দমবন্ধ পরিবেশেও প্রমথ চাই তার ঘরে ফিরুক একটুখানি আনন্দ, একটুখানি উষ্ণতা— অথচ সেই আনন্দ এসে পৌঁছায় না। ভাত ঠান্ডা হয়, মাংস ঠান্ডা হয়, আর সম্পর্কও ঠান্ডা হয়ে যায়।

অমিয়া সংসারের প্রতিদিনের পরিক্রমায় বন্দি এক নারী। তার কাজ সংসার টিকিয়ে রাখা, কিন্তু সে জানে না সংসারও এক ধরনের ভেলা— প্রতিদিন ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচার লড়াই। প্রমথ ও অমিয়ার সম্পর্ক একসময় যেমন ম্লেন ও সঙ্গীতময় ছিল, আজ তা নিস্তব্ধ ও অবসন্ন। তারা একে অপরের পাশে থাকে, অথচ কেউ কারও কাছে নেই। তাদের ভালোবাসা বেঁচে আছে নিঃশব্দে, যেমন নদীর নিচে স্রোত থাকে অদৃশ্য। তাই প্রমথের মনের গভীর থেকে উঠে আসে সেই নিঃসাড় স্বীকারোক্তি—

“জীবনটা যেন ডাল-ভাত হয়ে গেছে। ওঠানামা নেই, স্বাদগন্ধ নেই, কিছু নেই, কিছু নেই, তবু কেটে যাচ্ছে দিনগুলো। আশ্চর্য এই ভোঁতার মতো বেঁচে থাকাটাও একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। বদ অভ্যাস।”^১

এই বাক্যটিই আসলে মতি নন্দীর গল্পের কেন্দ্রবিন্দু। এটি শুধু এক ব্যক্তির অসহায়তা নয়, বরং এক সমগ্র প্রজন্মের নিঃসাড় জীবনবোধের প্রতিধ্বনি— যেখানে অর্থনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক অনিশ্চয়তা ও মানসিক ক্লান্তি মানুষকে করে তুলেছে যান্ত্রিক।

গল্পে অমিয়ার কন্যা পুতুল— নামের মধ্যেই যেন নিহিত আছে প্রতীক। সে নড়ে, কিন্তু নিজের মতো নয়; তাকে নাড়ায় সমাজ, সংসার, নিয়ম। পুতুলের জন্য ভালো পাত্র দরকার, কিন্তু ভালো পাত্রের জন্য প্রয়োজন টাকা— এ এক অচল নিয়ম, যেখান থেকে কোনো মুক্তি নেই। মায়ের মুখে সেই নির্মম উপলব্ধি—

“সচ্ছল ঘরে পুতুলকে দেওয়া যাবে না।”^২

এই একটি বাক্যের ভেতরেই ধরা পড়ে শ্রেণি ও লিঙ্গের দ্বৈত যন্ত্রণা— যেখানে মেয়ের জীবনের পরিণতি নির্ধারিত হয় অর্থনৈতিক বাস্তবতায়। অমিয়া জানে—

“বাপের অবস্থা বুঝে স্বাদ-আহ্লাদ গুলো চেপে রাখে, বাবা-মাকে লজ্জায় ফেলে না। এ একমাত্র মেয়েরাই পারে, পুতুলের মতো মেয়েরা।”^০

আসলে সংসার চালাতে গেলে অনেক কিছু ‘চেপে রাখতে’ হয়। তাই সে নিজের মেয়ের স্বপ্নকে আটকে দেয়, তার হাসিকে বেঁধে রাখে। অথচ এক মুহূর্তের জন্যও মায়ের ভালোবাসা হারায় না— বরং সে ভয় পায়, মেয়েকে যেন তার চেনা দুঃখের ভেলায় চেপে বসতে না হয়। কিন্তু এই ভয়ই তার অজান্তে তাকে বেহুলার মতো করে তোলে— যে নিজের আনন্দকে বিসর্জন দেয়, কন্যার ভবিষ্যতের জন্য বাঁচে, আর শেষ পর্যন্ত নিজের নিঃসঙ্গতার নদীতে একা ভেসে থাকে।

গল্পের শেষে পুতুল না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, আর টেবিলে পড়ে থাকে রঞ্জের মতো লাল মাংস— এটি শুধু এক পরিবারের ভগ্ন আহ্বারের দৃশ্য নয়, বরং এক যুগের প্রতীকচিত্র। সেই মাংসের রঙে যেন জমাট বেঁধে থাকে অমিয়ার অব্যক্ত কান্না, প্রমথের অপ্রকাশিত ক্লান্তি, আর পুতুলের নীরব বিদ্রোহ। মাংসটি খাওয়া হয় না— কারণ সেটি আসলে তৃপ্তির নয়, বরং অপূর্ণতার প্রতীক; ভালোবাসা যা আজ আর জীবনের টেবিলে পরিবেশন হয় না।

এখানেই গল্পটি বিনির্মিত হয়ে ওঠে মনসামঙ্গলের আদি পাঠ থেকে। পুরাণের বেহুলা স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে নদীতে ভাসে; মতি নন্দীর বেহুলা ভাসে সংসারের অন্ধকার নদীতে, যেখানে দেবতা নেই, আছে কেবল মানুষ। এই বেহুলা আর প্রার্থনা করে না— সে লড়ে। সে জানে, মুক্তি দেবতার নয়, মানুষের হাতেই নিহিত। তাই ‘বেহুলার ভেলা’ হয়ে ওঠে আধুনিক সময়ের আত্মসংগ্রামের প্রতীক, যেখানে প্রতিটি ঘরই এক নদীতরী, প্রতিটি মানুষই একাকী মাঝি।

মতি নন্দীর লেখালেখি আমাদের সামনে এক কঠিন উপলব্ধি তুলে ধরে— জীবন থামে না, এমনকি তখনও না, যখন তার সমস্ত তীক্ষ্ণতা ক্ষয়ে গিয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। মানুষের অস্তিত্ব কোনো আবেগের বিস্ফোরণে নয়, বরং অভ্যাসের এক নীরব চাপে টিকে থাকে। এই অভ্যাসই মানুষকে প্রতিদিন আবার উঠতে বাধ্য করে, আবার দায়িত্বের ভার কাঁধে তুলে নিতে শেখায়, আবারও একই পথ পাড়ি দিতে প্ররোচিত করে। বেঁচে থাকা এখানে কোনো মহৎ সংকল্প নয়; তা এক অনিবার্য অনুশীলন।

এই নিরবচ্ছিন্ন চলনই আজকের বেহুলার ভেলা। এটি কোনো অলৌকিক বিশ্বাসে ভর করে ভাসে না, ভাসে মানুষের ভিতরের জেদে—যে জেদ তাকে বারবার ভেঙে পড়ার পরও টেনে নিয়ে যায় সামনের দিকে। সময়ের স্রোত এখানে নিষ্ঠুর, কিন্তু অচল নয়; আর ভেলাটি দৃশ্যত নড়বড়ে হলেও ডুবে যায় না। কারণ এর কাঠামো গড়া হয়েছে মানুষের অদৃশ্য সহনশীলতা দিয়ে।

এই যাত্রা উচ্চকিত নয়, তাতে নেই বিজয়ের ঘোষণা। তবু তার মধ্যে এক অদ্ভুত মর্যাদা আছে—কারণ প্রতিটি মুহূর্তে সে প্রমাণ করে, জীবন মানেই প্রতিরোধ। চলতে থাকা নিজেই এখানে এক ধরনের প্রতিবাদ, ক্লান্তিকে অস্বীকার করার নীরব ভঙ্গি। তাই মতি নন্দীর বেহুলা আর কোনো পৌরাণিক নারী নয়; তিনি সেই সমস্ত মানুষদের প্রতিরূপ, যারা কিছু না বলেই প্রতিদিন বেঁচে থাকার কাজটি করে যান। এই অর্থে ‘বেহুলার ভেলা’ কোনো কাহিনীর সমাপ্তি নয়; এটি জীবনের এক স্থায়ী অবস্থা। সময় তাকে ক্ষয় করে, ভারী করে তোলে, তবু সে থামে না। কারণ মানুষের মধ্যে এমন এক জেদ আছে, যা ধ্বংসের মধ্যেও চলার পথ খুঁজে নেয়।

মনসামঙ্গলের বেহুলা আমাদের কাছে কেবল পৌরাণিক নায়িকা নয়, তিনি চিরন্তন নারীর প্রতীক— যিনি ভালোবাসা, বুদ্ধি ও সাহস দিয়ে মৃত্যুরও সীমা অতিক্রম করেছিলেন। তাঁর ভেলা ছিল জীবনের প্রতীক, বিশ্বাসের প্রতীক। নদী ছিল তাঁর আশ্রয়, আর প্রেম ছিল তাঁর দেবতা। কিন্তু মতি নন্দীর ‘বেহুলার ভেলা’ য় সেই নদী শুকিয়ে গেছে, সেই দেবতা আর নেই, সেই ভেলাও আজ ভেসে চলে শুধু অস্তিত্বের দুঃসহ স্রোতে।

এখানে বেহুলা কোনো নাম নয়, বরং এক অনুভব— এক স্তব্ধতা, যা প্রমথ ও অমিয়ার সংসারের প্রতিটি কোণে লুকিয়ে আছে। গল্পটি মনসামঙ্গলের উজ্জ্বল আলোকে অতিক্রম করে প্রবেশ করেছে আধুনিক জীবনের ধূসর অন্ধকারে, যেখানে ভালোবাসার স্থান নিয়েছে অভ্যাস, আর সম্পর্কের উষ্ণতা পরিণত হয়েছে নিঃসাড় সহাবস্থানে। মনসামঙ্গলে বেহুলা প্রাণ ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল— কিন্তু মতি নন্দীর বেহুলা তা পারে না। কারণ এই যুগে মৃত্যু আসে অন্য রূপে— ভালোবাসার মৃত্যু, সংযোগের মৃত্যু, অনুভূতির মৃত্যু। এখানে কারও শরীর মরে না, অথচ সম্পর্কের ভেতর ক্রমে জমে ওঠে

শীতল মৃত্তিকা। প্রমথ ও অমিয়ার দাম্পত্য সেই মৃত সংসারের প্রতীক— যেখানে তারা পাশাপাশি থাকে, কিন্তু একে অপরের কাছে অনুপস্থিত। তাদের চোখে আর নেই স্বপ্নের আলো, নেই আবেগের আগুন— আছে কেবল ক্লান্ত এক বেঁচে থাকা।

প্রমথের দৃষ্টিতে অমিয়ার চোখ আজ “কসাইয়ের ছুরির মতো”^৪ — অর্থাৎ ভালোবাসার উষ্ণতা নয়, বরং কাটা ও ক্ষতের প্রতীক। আর অমিয়ার চোখ “মরা পাঁঠার মতো”^৫ — প্রাণহীন, স্থির, নিরাবেগ। এই প্রতীকের মধ্যেই লেখক ধরেছেন আধুনিক সম্পর্কের আসল সত্য: এখানে মানুষ বেঁচে থাকে, কিন্তু ভালোবাসা আর বাঁচে না। সংসার টিকে থাকে, কিন্তু প্রাণহীন ভেলার মতো, যাকে ঠেলে নিয়ে চলে শুধু অভ্যাস।

মতি নন্দী বেহুলার পৌরাণিক মহিমাকে নস্যৎ করেননি; বরং তার মানবিক রূপটিকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর বেহুলা দেবতার মুখোমুখি নয়— বাস্তবতার মুখোমুখি। দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ নয়, যুদ্ধ এখন সময়ের সঙ্গে, ক্লান্তির সঙ্গে, অভাবের সঙ্গে। প্রমথ ও অমিয়ার সংসার তাই আজকের সমাজের প্রতীক— যেখানে মানুষ একসঙ্গে থেকেও একা, যেখানে সংসার চলে, কিন্তু বেঁচে থাকে না। এখানে দেবী মনসা আর নেই, তবু রয়েছে তাঁর অভিশাপের ছায়া— সেই চিরন্তন অভিশাপ, যে মানুষকে বাধ্য করে প্রতিদিন বাঁচতে, অথচ বেঁচে থাকার কোনো আনন্দ দেয় না। চাঁদ সদাগরের অভিমান আজ প্রমথের আত্মদ্বন্দ্ব ফিরে আসে, বেহুলার নিরন্তর যাত্রা আজ অমিয়ার নিঃসাড় গৃহজীবনে পুনর্জন্ম লাভ করে।

এইভাবে ‘বেহুলার ভেলা’ পুরাণকে ভেঙে গড়ে তোলে নতুন এক মানবিক পাঠ। এটি আর দেবতা ও মানুষের দ্বন্দ্বের গল্প নয়, বরং মানুষ ও তার একাকীত্বের কাহিনি। মতি নন্দীর কাহিনিতে নদী বদলে গেছে, স্রোতও পাল্টেছে— এখন এই নদী কেবল সংসারের দায়-দায়িত্ব, ক্লান্তি ও অভাবের জলধারা। অথচ তবুও সেই ভেলা ভাসে, কারণ মানুষ এখনো হারায়নি বেঁচে থাকার অভ্যাস। এই অভ্যাসই আধুনিক বেহুলার সত্য। সে আর স্বামীকে ফিরিয়ে আনে না, সে ফিরিয়ে আনে দিনযাপনকে। তার লড়াই জীবনের সঙ্গে নয়, শূন্যতার সঙ্গে। তাই মতি নন্দীর বেহুলা কোনো পৌরাণিক অলৌকিকতা নয়, বরং আমাদের প্রতিদিনের নিঃশব্দ সংগ্রাম— যেখানে জীবন ভাসে না আনন্দে, ভাসে কেবল টিকে থাকার ক্লান্ত স্রোতে।

মতি নন্দীর ‘বেহুলার ভেলা’র সময়কাল একটিমাত্র দিন— সকাল থেকে রাত। কিন্তু এই একদিনই যেন এক যুগের প্রতীক, যেখানে জীবনের সমস্ত উষ্ণতা, ক্লান্তি, জ্বালা ও অন্ধকার একত্রে মিশে গেছে। ঋতু গ্রীষ্মকাল, প্রকৃতি দগ্ধ— আর এই প্রখরতা শুধু আবহমানের নয়, মানুষের মনেরও প্রতিচ্ছবি। গরমের দাবদাহে যেমন পৃথিবী জ্বলতে থাকে, তেমনি সম্পর্কের ভিতরেও জমে থাকে অদৃশ্য আগুন— ভালোবাসার, আকাঙ্ক্ষার, হতাশার, দহন ও ভয়ের আগুন। এই আগুন কখনো আলো দেয়, কখনো পোড়ায়। ভালোবাসা যেমন উষ্ণতা আনে, তেমনি প্রখরতা আনে ভয়াবহতা— আগুন যেমন জীবন রক্ষা করে, তেমনি ভস্মও করে। গল্পের এক স্থানে বলা হয়েছে—

“ঘরের মধ্যে যেন চিতা জ্বলছে।”^৬

এই চিতা কেবল অমিয়ার দগ্ধ জীবনের নয়, নয় প্রমথের ক্লান্ত পুরুষত্বের— এটি দগ্ধ সংসারের, দগ্ধ স্বপ্নের, দগ্ধ ভালোবাসার প্রতীক। এই চিতা জ্বলে গোপনে— একদম দৈনন্দিনের ভেতরে, খালায় পরিবেশিত ঠান্ডা ভাতের পাশে, একটুকরো রক্তের মতো লাল মাংসের পাশে। এই গরম যেন যুদ্ধোত্তর সমাজের রূপক— যেখানে প্রতিটি মানুষ নিজের ভিতরে বহন করছে একেকটা চিতার আগুন। কেউ তাকে নেভাতে পারে না, শুধু টেনে নিয়ে চলতে হয়। তাই প্রজন্মের পর প্রজন্ম একইভাবে এই দগ্ধ ভেলাকে ঠেলে এগিয়ে যায়— বাঁচার নয়, টিকে থাকার উদ্দেশ্যে। ভবিষ্যৎ নেই; আছে শুধু পুনরাবৃত্তি, ক্লান্ত পুনর্জন্মের মতো একরকম বেঁচে থাকা।

গল্পের সময়চক্রটিও তাই অর্থবহ। সকাল দিয়ে শুরু, রাত দিয়ে সমাপ্তি— আলো থেকে অন্ধকারে যাত্রা। কিন্তু এই দিনমান প্রগতি নয়, পতন। যেখানে দিনের আলো নতুন জীবনের সূচনা নয়, বরং একটি নতুন নিঃসাড়তার আভাস। প্রমথ-অমিয়ার সংসারে কোনো সূর্যোদয় নেই— তাদের জীবন স্থির, অবদমিত, দমবন্ধ। তাই গল্পের শেষে রাতের অন্ধকার যেন কেবল প্রকৃতির নয়, মানুষের মনেরও প্রতীক— সেই মনসার সর্পিলা অন্ধকার, যা ধীরে ধীরে ঘিরে ফেলে প্রতিটি প্রাণীকে। এই অন্ধকার মনসার নয়, সময়ের। মহাশ্বেতা দেবীর ‘বেহুলা’ গল্পে আমরা যে অন্ধকার দেখি, সেখানে রয়েছে

প্রতিবাদের দীপ্তি; শেষপর্যন্ত সেখানে আলো ফিরে আসে। কিন্তু মতি নন্দীর ‘বেহুলার ভেলা’য় সেই আলো নিভে গেছে। এখানে কোনো মুক্তি নেই, নেই কোনো সামাজিক জাগরণ— আছে শুধু বেঁচে থাকার স্ববিরতা। এখানকার বেহুলা মৃত লক্ষ্মিন্দরকে নয়, জীবিত মড়াকে আগলে রাখে। জীবনের চেয়ে মৃত্যুই এখন বাস্তব, কারণ ভালোবাসা মৃত, সম্পর্ক মৃত, শুধু শরীরটুকু জীবিত। প্রমথের স্বীকারোক্তি তাই নিছক নিরাশা নয়, বরং এক যুগের আত্মস্বীকার—

“জানো আমি, মনে হচ্ছে আমি আর ভালোবাসি না, বোধহয় তুমিও বাস না। তা না হলে তোমার মনে হবে কেন আমি তোমার গায়ে হাত তুলতে পারি। অথচ সত্যি সত্যি তখন ইচ্ছে হয়েছিল তোমার গলা টিপে ধরি। আমি, এখন একটা মড়া আগলে বসে থাকা ছাড়া আর আমাদের কাজ নেই।”^৭

এই কথার ভেতরেই বেঁচে থাকার এক গভীর ট্রাজেডি লুকিয়ে আছে। আধুনিক মানুষের জীবন যেন এক মৃতদেহের প্রতিপালন— যেখানে প্রতিদিন বেঁচে থাকা মানে মৃত স্বপ্নকে বহন করা।

এইখানেই গল্পটি বিনির্মাণ করে মনসামঙ্গলের মূল পাঠ। বেহুলা লক্ষ্মিন্দরকে ফিরিয়ে এনেছিল— কিন্তু এখানে বেহুলা নিজেকে ফেরাতে পারে না। কারণ আজকার লক্ষ্মিন্দর বেঁচে আছে, অথচ মৃত। আজ চেতনা নেই, বিশ্বাস নেই, স্পন্দন নেই। তাই ভালোবাসার ঝাঁকুনি গলায় হাত তোলার মতো মনে হয়। এখানে পুনর্জীবন নয়, আছে পুনরাবৃত্তি— একই দুঃখ, একই সংঘাত, একই টিকে থাকা। প্রমথের মাসের শেষে মাংস কেনা, অমিয়ার রান্না করা, সন্তানের হাসি প্রত্যাশা— এগুলোই যেন আধুনিক যুগের পৌরাণিক যজ্ঞ। কিন্তু এই যজ্ঞে দেবতা নীরব, আল্হতি বৃথা। জিনিসের দাম বাড়ছে, যুদ্ধের ভয় ছড়িয়ে পড়ছে, মানুষ পিষ্ট হচ্ছে বিশাল হাতুড়ির আঘাতে—

“এইটুকুই সে চেয়েছিল। খুশি হোক অন্তত আজকের দিনটায়। জিনিসের দাম বাড়ছে, স্ট্রাইক হবে, মিছিল বেরোবে, ঘেরাও হবে, পুলিশ আসবে, রক্তগঙ্গা বইবে, এ তো হামেশাই হচ্ছে। মানুষকে যেন একটা কামার তাতিয়ে তাতিয়ে ক্রমাগত পিটিয়ে চলেছে বিরাট একটা ভারী হাতুড়ি দিয়ে। সুখ নেই, স্বস্তি নেই, হাসি নেই, খুশি নেই।”^৮

‘বেহুলার ভেলা’ একদিনের কাহিনি হলেও, তার পরিধি এক সময়ের ইতিহাস। এটি যুদ্ধকালীন নগরজীবনের কাহিনি যেমন, তেমনি মানবিক শূন্যতারও দলিল। এখানে ভেলা ভাসে না নদীতে, ভাসে অস্তিত্বের স্রোতে— যেখানে বেহুলা আর লক্ষ্মিন্দর কেউই জীবনের অর্থ উদ্ধার করতে পারে না, শুধু মৃত অভ্যাসকে বহন করে চলে। এইভাবেই মতি নন্দী মনসামঙ্গলের মিথকে ভেঙে গড়ে তোলেন আধুনিক জীবনের প্রতীকে। তাঁর বেহুলা দেবী নয়, গৃহবধু; তাঁর নদী গঙ্গা নয়, ঘরের ভেতরের গরম বাতাস; তাঁর লক্ষ্মিন্দর মৃত নয়, বেঁচে থেকেও মৃত এক মানুষ। আর তাঁদের ভেলা, যা একসময় মুক্তির প্রতীক ছিল, আজ তা পরিণত হয়েছে দক্ষ জীবনের, অবিরাম পুনরাবৃত্তির প্রতীকে— এক অস্তিত্ববাদী সত্যে জীবন টিকে থাকে, ভালোবাসা নয়।

মতি নন্দীর ‘বেহুলার ভেলা’র সমগ্র কাহিনি আবর্তিত হয়েছে মাংস রান্নাকে কেন্দ্র করে। বাটা-মসলা দিয়ে মাংস সুস্বাদু করা হচ্ছে, কিন্তু সেই সুগন্ধের ভেতর লুকানো আছে এক প্রখর প্রতীক— গর্দানের নরম অংশ, যা যেন ভেঙে ফেলার মতোই সংবেদনশীল। গল্পে এই মাংস কেবল খাদ্য নয়, বরং সময়ের জটিলতার, জীবনের উত্তপ্ত দাবদাহের, এবং মানুষের অস্তিত্বের প্রতীক। আজ এই পরিবার, এই মানুষরা— রক্ত-মাংসের, অথচ চামড়া হারানো। সুখ, স্বপ্ন, ভালোবাসা— সব ধীরে ধীরে সময়ের কাছে ভক্ষণ করা হচ্ছে। এখানে সময় নিজেকে নিয়ে এসেছে দায়িত্ব, ক্লান্তি এবং এক ক্রমাগত টিকে থাকার যন্ত্রণায়। মাংসের প্রতি সংবেদনশীলতা, রান্নার প্রতি যত্ন, বাটার ঘোলানো— সবই জীবনের এক ক্ষুদ্র আনন্দ, অথচ এই ক্ষুদ্র আনন্দটুকু পুরোপুরি উপলব্ধি করা যায় না। প্রতিটি লাঞ্ছ, প্রতিটি ভাতের কণার মধ্যে লুকিয়ে আছে জীবনের ক্ষয়— শুধু শারীরিক ক্ষয় নয়, বরং মানসিক ও আবেগীয় ক্ষয়। এই মাংসই আজ বেঁচে থাকা মানুষের প্রতীক। মাংসের লাল রঙ যেন চোখে পড়ে মানুষের রক্তমিশ্রিত বাস্তবতার, যেটা সময়ের তাপ ও চাপের মধ্য দিয়ে প্রতিটি জীবকে গঠন করেছে।

পুরাণের বেহুলা যেভাবে মৃত স্বামীকে বাঁচিয়েছিল, আজকের বেহুলা—প্রতিটি মানুষ—কেবল জীবিত। তবে জীবিত মানে প্রাণহীন নয়, বরং সময়ের ক্রমশ ধ্বংসাত্মক ভেলাকে বহন করার শক্তি। প্রমথের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় সেই অস্তিত্বের দার্শনিক স্বীকারোক্তি—

“কেঁদো না, মরে গেলেই মানুষ কাঁদে, আমি কি মরে গেছি।”

এখানেই আধুনিক বেহুলার তত্ত্ব প্রকাশ পায়। আজকের লক্ষ্মিন্দরের মরে না। তারা বেঁচে থাকে ভালোবাসাহীন সংসারের বোঝা, দায়িত্ব ও অভ্যাসের সঙ্গে। তবে এই বেঁচে থাকা কোনো আনন্দ দেয় না, বরং একটি শূন্য-চেতনার মধ্য দিয়ে টিকে থাকা। পুরনো বেহুলা-লক্ষ্মিন্দরের কাহিনি বিনির্মাণ হয়ে আজকের সময়ে ফিরে এসেছে নতুন আঙ্গিকে— যেখানে বেহুলা আর একজন নায়িকা নয়, লক্ষ্মিন্দরও আর একটি চরিত্র নয়। তারা প্রতিটি পাঠক, প্রতিটি ঘর, প্রতিটি সময়ের সঙ্গে টিকে থাকা মানুষ। এই কাহিনি আমাদের সামনে একটি অস্বস্তিকর সত্য উন্মোচিত করে—জীবনের মানচিত্রে কেউ কেবল বেহুলা নয়, কেউ কেবল লক্ষ্মিন্দরও নয়; আমরা প্রত্যেকেই একই সঙ্গে বহন করি এই দুই সত্তার ছায়া। আমাদের প্রত্যেকের হাতে রয়েছে এক অদৃশ্য যান, যা নদীতে ভাসে না, ভাসে সময়ের ভিতর। সেই যানে সঞ্চিত থাকে দায়িত্বের ভার, নিত্যদিনের লড়াই, ক্রমাগত ক্ষয়, আর সেই ক্ষয়ের ভেতর থেকেই জন্ম নেওয়া নতুন রূপের সম্ভাবনা। জীবন এখানে কোনো এককালীন অর্জন নয়; এটি বারবার ভেঙে পড়ার, আবার নিজেকে গড়ে তোলার এক অনবরত প্রক্রিয়া।

সময়ের প্রবাহে আমাদের দৈনন্দিন অভ্যাস, চিন্তার কাঠামো, অনুভবের ভাষা— সবই ধীরে ধীরে বদলে যায়। আমরা যাকে স্থায়ী বলে মনে করি, তা আসলে ক্ষণস্থায়ী; আর যাকে তুচ্ছ ভাবি, সেটিই কখনো কখনো আমাদের অস্তিত্বের ভার বহন করে। প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের সামনে খুলে দেয় নতুন ব্যাখ্যার দরজা— যেখানে পুরোনো স্মৃতি ভেঙে পড়ে, আর নতুন অর্থ নির্মিত হয়। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই সমকাল নিজেকে প্রকাশ করে, নিজের ভাষা খুঁজে পায়। এই যাত্রাপথে পুরাণ কোনো বন্ধ অতীত নয়; বরং তা একজীবন্ত কাঠামো, যা নতুন বাস্তবতার স্পর্শে রূপান্তরিত হয়। মঙ্গলের আখ্যান আধুনিক জীবনের ভেতর এসে আর দেবতার গল্প থাকে না— তা পরিণত হয় মানুষের সংগ্রামের ভাষায়। এখানে পুনর্নির্মাণ কোনো অনুকরণ নয়, বরং নতুন পরিস্থিতিতে অর্থের পুনর্নির্মাণ। পুরাণ ভাঙে না, সে স্থানান্তরিত হয়— এক সময়ের বিশ্বাস থেকে আরেক সময়ের প্রশ্নে।

এই কারণেই ‘বেহুলার ভেলা’ শুধুমাত্র একটি আখ্যান নয়; এটি এক চলমান রূপক। এই ভেলা গন্তব্যের দিকে এগোয় না— এগোয় টিকে থাকার তাগিদে। তার যাত্রা থেমে যায় না, কারণ থেমে যাওয়া মানেই বিলুপ্তি। সময়ের স্রোতে ভেসে চলতে চলতেই সে সংগ্রহ করে নতুন অনুভব, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন সম্ভাবনা। সমকালীন পাঠক এইখানেই নিজের প্রতিচ্ছবি আবিষ্কার করে। জীবন, সম্পর্ক, আশা ও আশঙ্কা— সবকিছু একই যানে গাঁথা। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই যাত্রা বহন করে চলে, কখনো সচেতনভাবে, কখনো অজান্তে। বেহুলা ও লক্ষ্মিন্দর আজ আর নির্দিষ্ট চরিত্র নয়; তারা আমাদের অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতার নাম। ভেলা হয়তো এগিয়ে চলে, কিন্তু মানুষের বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রামের স্মৃতি, আর সময়ের নিরন্তর রূপান্তর— এসবই থেকে যায়, অবিনশ্বর হয়ে।

Reference:

১. মতি, নন্দী, ছোটগল্প সমগ্র, সম্পাদনা-মানস চক্রবর্তী, দীপ প্রকাশন, কলকাতা ৭৩, প্রথম সংস্করণ: ১লা বৈশাখ ১৪১৯, পুনর্মুদ্রণ: ১লা বৈশাখ ১৪২০, পৃ. ১০৮
২. তদেব, পৃ. ১০৯
৩. তদেব, পৃ. ১০৩
৪. তদেব, পৃ. ১১২
৫. তদেব, পৃ. ১১২
৬. তদেব, পৃ. ১১৩

৭. তদেব, পৃ. ১১৪

৮. তদেব, পৃ. ১০৩

৯. তদেব, পৃ. ১১৪